চিরসবুজ নায়ক আলমগীর

মৌ সন্ধ্যা

জীবনের চুয়াত্তরটি বসন্ত পার করেছেন তিনি। শুধু সিনেমা জীবনেরই পঞ্চাশ বসন্ত কেটে গেছে। একজীবনে দর্শকের ভালোবাসা যেমন পেয়েছেন তেমনি রাষ্ট্রের কাছেও পেয়েছেন সম্মান। বাংলা চলচ্চিত্রকে একইসঙ্গে অভিনয়, নির্মাণ ও প্রযোজনা দিয়ে সমৃদ্ধ যারা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম আলমগীর। ক্যারিয়ারের এতগুলো বছর পার করে এখনো চিরসবুজ হয়ে আছেন আলমগীর। সবার প্রিয় এই মানুষটির পথচলার গল্পটি কেমন ছিল, তা অনেকেরই অজানা। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম কতটুকুই বা জানেন এই গুণী মানুষটি সম্পর্কে। চলুন জেনে নেই নায়ক আলমগীরের ফেলে আসা সোনালি দিনগুলো সম্পর্কে।

একুশে পদক প্রাপ্তি

এ বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার একুশে পদক প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পুরস্কারপ্রাপ্ত ২১ জনের মধ্যে ছিলেন চিরসবুজ চলচ্চিত্র নায়ক আলমগীর (এম এ আলমগীর)। তিনি অভিনয় ক্যাটাগরিতে একুশে পদকে ভূষিত হন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে সেদিন তিনি গ্রহণ করেন একুশে পদক ২০২৪।

একুশে পদক প্রাপ্তির অনুভূতি

চিত্রনায়ক আলমগীর বিভিন্ন গণমাধ্যমে তার একুশে পদক প্রাপ্তির অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন। এক গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'প্রথমত আমি এই পুরস্কারটি পেয়ে আনন্দিত। দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড এটা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও দেশের সরকারকে ধন্যবাদ জানাই, এই পুরস্কারে আমাকে যোগ্য মনে করার জন্য। অনেকে বলেন এটা একটু লেট। আমি বিশ্বাস করি না সেটা। পৃথিবীতে কোনো কিছুই লেট নয়। আপনি যতদিন বেঁচে আছেন আপনি যতদিন কর্মক্ষম থাকবেন কাজ করবেন। স্বীকৃতি তো আসবেই। এটা অবশ্যই বিরাট পাওনা যে আমি জীবদ্দশায় পুরস্কারটি

পেয়েছি। অনেকে আছে মরণোত্তর পায়। সেটা নিয়ে কমেন্ট করাটা এই মুহূর্তে ঠিক নয়। যারা পাচ্ছে পাক। তাদের স্বীকৃতির সময় হয়তো সেই সময় আসেনি। তাদের থেকেও সিনিয়র কেউ হয়তো তখন ছিল, যারা তাদের থেকে অনেক বেশি কাজ করেছে। কাজ করতে হবে। লাইনে দাঁড়াতে হবে। একটা টিকিট কাউন্টারে লাইনের শেষে যে লোকটি দাঁড়ায় সেও কিন্তু একসময় ফার্স্ট হয়। কারণ সে যখন সিরিয়াল পায় তখন সে সবার প্রথমেই থাকে।'

যেভাবে চলচ্চিত্রে পা

৫০ বছর আগে ১৯৭২ সালের ২৪ জুন আলমগীর কুমকুম পরিচালিত 'আমার জন্মভূমি' চলচ্চিত্রের জন্য প্রথমবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন আলমগীর। এরপর আরও একটি সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন তিনি। অভিষেকটা হয়েছিল দারুণভাবে। পরের বছর ১৯৭৩ সালে ঈদে একসঙ্গে মুক্তি পেয়েছিল মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক 'আমার জন্মভূমি' এবং 'দস্যুরানী' নামের দুটি ছবি। বাকিটা ইতিহাস। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। এরপর একের পর এক সিনেমায় নাম লিখিয়েছেন, অভিনয় করেছেন আর দর্শকের মন জয় করেছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকাই সিনেমার সেরা হিরোদের কাতারে চলে এসেছেন। ঢালিউডে রাজত্ব করেছেন দীর্ঘ সময় ধরে। ঢাকাই সিনেমার সোনালি দিনগুলোর দিকে তাকালে অনেক সুপারহিট সিনেমার পোস্টারে দেখা যাবে নায়ক আলমগীরের ছবি। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছিলেন তিনি। বলা যায় সোনার চামচ মুখে নিয়েই বেড়ে উঠেছেন। কিন্তু সিনেমায় নাম লেখানোর আগে ও পরে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকেও। তার নায়ক হয়ে ওঠার গল্পটা অন্যরকম।

নায়ক হয়ে ওঠার গল্প

চলচ্চিত্রকার, প্রযোজক, পরিচালক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলমগীর কুমকুম প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন নায়ক আলমগীরকে। 'পদ্মা নদীর মাঝি' সিনেমা নির্মাণ করে ১৯৬৯ সালে চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন কুমকুম। গুণী এই মানুষটির কারণেই আমরা পেয়েছি নায়ক আলমগীরকে। প্রয়াত চলচ্চিত্র পরিচালক কুমকুমকে নিয়ে বিভিন্ন সময় স্মৃতিচারণ করেন আলমগীর। এক সাক্ষাৎকারে আলমগীর বলেছেন, 'স্যার আলমগীর কুমকুমের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় একটি ফটো স্টুডিওতে। আমি ছবি আনতে গিয়েছিলাম, তিনি বসে ছিলেন। আমার ছবি দেখে জানতে চাইলেন, আমি চলচ্চিত্রে কাজ করতে চাই কি না। আমি কোনো উত্তর না দিয়েই চলে আসি। তারপর দ্বিতীয়বার দেখা হয় যখন তিনি বাসা ভাড়া নিতে এসেছিলেন আমাদের ওখানে, সেখানে একটি চলচ্চিত্রের অফিস করতে চান। আমি চলচ্চিত্রের অফিস শুনে ভাড়া দিব না বলে দেই। তখন তিনি আমাকে আবারও চলচ্চিত্রে কাজ করতে বলেন। বিষয়টি নিয়ে আমি পরিবারের সঙ্গে কথা বলি এবং মুক্তিযুদ্ধের ছবির কথা শুনে সবাই রাজি হয়। একদিন তেজগাঁওয়ে উনার অফিসে গিয়ে কথা বললাম। কিছুক্ষণ কথা বলে বের হয়ে যাচ্ছি, তখন শুনতে পাই আমার কাজ করা হবে না। কেন জানতে চাইলে শুনতে পাই, আমার উচ্চারণ ভালো না। পরের সপ্তাহে আমি আবার যাই উচ্চারণ ঠিক করে এবং উনার সঙ্গে কথা বলি। এক সপ্তাহ পর আমার উচ্চারণ শুনে তিনি হেসে দিয়ে বলেন, এক সপ্তাহের চেষ্টায় যে ভাষা চেঞ্জ করতে পারে সে অবশ্যই চলচ্চিত্রে জন্য উপযুক্ত। এভাবেই আমি উনার হাত ধরে চলচ্চিত্রে কাজ শুরু করি।'

আলমগীর আরও বলেন, 'প্রথমদিন শুটিংয়ের কথা আমি কোনোদিন ভুলব না। প্রথমে যেদিন শুটিং করতে যাই মহেড়াতে সেখানে নায়করাজ একটি রুম পেলেন থাকার জন্য। কবরী ম্যাডাম রুম পেলেন। সবাই সবার মতো জায়গা নিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি আর ক্যামেরাম্যান মাহফুজ থাকার কোনো জায়গা পেলাম না। তখন ম্যানেজার গিয়ে কুমকুম স্যারকে বিষয়টি জানালে আমাদের দুজনকে বারান্দায় খড় বিছিয়ে শুতে দেন। আমরা সেখানেই ঘুমিয়েছিলাম। কবরী ম্যাডাম কুমকুম স্যারের কাছে জানতে চাইলেন কেন আমাদের বারান্দায় শুতে দিলেন! উত্তরে তিনি বলেন, এভাবে কষ্ট করে যদি চলচ্চিত্রে কাজ করতে পারে তা হলে থাকুক, না হয় চলে যাক। যদি থাকতে পারে তবেই চলচ্চিত্রের জন্য কিছু করতে পারবে। আমি চলচ্চিত্রের জন্য কী করতে পেরেছি জানি না, কিন্তু আমি মানুষ হতে পেরেছি। এখানে কাজ করতে না পারলে হয়তো অন্য কোনো কাজ করতাম, কিন্তু মানুষ হতে পারতাম কি না; জানি না।'

দর্শকনন্দিত নায়ক

আশি ও নব্বইয়ের দশকে দাপটের সঙ্গে একের পর এক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন আলমগীর। পারিবারিক টানাপোড়েন, সামাজিক অ্যাকশন, রোমান্টিক অ্যাকশন, ফোক-ফ্যান্টাসিসহ সব ধরনের চলচ্চিত্রে তিনি ছিলেন সফল। এ পর্যন্ত তিন শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন আলমগীর। শাবানার সঙ্গে জুটি হিসেবে তুমুল হিট ছিলেন আলমগীর। শাবানার সঙ্গে জুটি বেঁধে প্রায় ১০৪টি সিনেমাতে অভিনয় করেছেন তিনি। এছাড়াও অভিনয় করেছেন সেই সময়ের সুপার হিট কবরী, ববিতা, রোজিনা, সুচরিতা, অঞ্জুসহ সমসাময়িক প্রায় সব নায়িকাদের বিপরীতেই।

পুরস্কারেও রেকর্ড

১৯৮৫ সালে 'মা ও ছেলে' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন এই অভিনেতা। সবমিলিয়ে মধ্যে ৯ বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ আজীবন সম্মাননা পদক পাবার রেকর্ড নায়ক আলমগীরেরই রয়েছে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে তার পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনেমাগুলো হলো 'মা ও ছেলে' (১৯৮৫), 'অপেক্ষা' (১৯৮৭), 'ক্ষতিপূরণ' (১৯৮৯), 'মরণের পরে' (১৯৯০), 'পিতা মাতা সন্তান' (১৯৯১), 'অন্ধ বিশ্বাস' (১৯৯২) ও 'দেশপ্রেমিক' (১৯৯৪)। শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্রে অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পরস্কার পান 'জীবন মরণের সাথী' (২০১০) ও 'কে আপন কে পর' (২০১১) সিনেমায়।

পরিচালক

নায়ক হিসেবে তুমুল জনপ্রিয় থাকা অবস্থাতেই সিনেমার পরিচালক হিসেবে নাম লিখিয়েছিলেন আলমগীর। ১৯৮৬ সালে তিনি প্রথম 'নিষ্পাপ' নামের একটি সিনেমা নির্মাণের মধ্য দিয়ে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। সিনেমার পরিচালক হিসেবেও সুনাম কুড়ান। তার নির্মিত সর্বশেষ ছবি 'একটি সিনেমার গল্প'। এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন কলকাতার নায়িকা ঋতুপর্ণা ও বাংলাদেশের নায়ক আরিফিন শুভ।

বিনয়ী নায়ক

বড় মানুষরা বিনয়ী হন। যে গাছ যত ফলে ভরপুর, সেই গান ততই মাথা নুয়ে থাকে। বাংলা সিনেমার বটবৃক্ষ আলমগীরও তেমনই। মাত্র ২২ বছর বয়সে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। এরপর ৫০ বছর ধরে চলচ্চিত্রের সাথেই আছেন। জীবনের সিংহভাগ সময় অভিনয়ে দেওয়ার পরও নায়ক আলমগীরের নিজেকে নিয়ে মন্তব্য, 'এখনো সুঅভিনেতা হতে পারিনি। কারণ শিল্পী হওয়া এত সহজ নয়। অভিনয়ে পূর্ণমান ১০০-তে নিজেকে পাস মার্কস দিতে রাজি; এর বেশি নয়'।

কণ্ঠশিল্পী

সিনেমার অনেক নায়ককে গায়ক পরিচয়েও পাওয়া গেছে। সেইপথে হেঁটেছেন আলমগীরও। কণ্ঠশিল্পী হিসেবে চলচ্চিত্রে গান গেয়েছেন তিনি। 'আগুনের আলো' চলচ্চিত্রে তিনি প্রথম কণ্ঠ দেন। এরপর তিনি 'কার পাপে', 'ঝুমকা' ও 'নির্দোষ' চলচ্চিত্রেও গান গেয়েছেন।

জন্ম ও পরিবার

১৯৫০ সালের ৩ এপ্রিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গুণী এ অভিনেতা জন্মগ্রহণ করেন। তার গ্রামের বাড়ি নবীনগর। চলতি বছর ৭২ বছরে পা রেখেছেন নায়ক। আলমগীরের প্রথম স্ত্রী ছিলেন গীতিকার খোশনুর আলমগীর। তাকে বিয়ে করেন ১৯৭৩ সালে। গায়িকা আঁখি আলমগীর তাদের কন্যা। খোশনুরের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের পর আলমগীর ১৯৯৯ সালে গায়িকা রুনা লায়লাকে বিয়ে করেন। বর্তমানে উপমহাদেশের কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লাকে নিয়েই সুখী পরিবার তার।

যোগ্য বাবার যোগ্য উত্তরসুরি

ঢাকাই সিনেমার নন্দিত নায়ক, প্রযোজক ও পরিচালক আলমগীরের বাবাও ছিলেন চলচ্চিত্রের মানুষ। এই তথ্যটি অনেকেই হয় তো জানেন না। আলমগীরের বাবা কলিম উদ্দিন আহম্মেদ ওরফে দুদু মিয়া ছিলেন ঢালিউডের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' এর অন্যতম প্রযোজক। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস জানতে গেলে সর্বপ্রথম এই সিনেমাটির নাম উঠে আসে। সবমিলিয়ে চিত্রনায়ক আলমগীর যোগ্য বাবার যোগ্য উত্তরসুরি।